Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 160-167
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শিশুমনের আনাচে-কানাচে : প্রসঙ্গ ‘পথের পাঁচালী’

সাগরিকা ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The term ‘child’ is generally used in broad aspect. It covers the three prime stages of human life i.e. infancy, childhood and adolescence. In these stages, children’s behaviour is very much important, which throws light on their psychology. Their joy, sorrow, anger, love— all the emotions actually unveil the various shades of their mind. At a particular moment how a child behaves or what he will do is solely the outcome of what is going on in his mind. Hence, the knowledge of child-psychology is really essential to understand a child. In Bengali literature, the two famous child characters are Apu and Durga. It is the magic of Bibhutibhushan Bandyopadhyay’s writings that makes the readers feel as if they are not imaginative characters but strongly exist. Throughout the whole novel, the different activities of these siblings attract readers’ attention and they feel deep attachment with these characters. Gradually, the readers become curious to unfold the mystery of their inner mind. The present article attempts to illuminate the different and intricate layers of child-psychology through their apparently meaningless activities on the basis of Bibhutibhushan Bandyopadhyay’s ‘Pather Panchali’.

Key words:* *Pather Panchali, Apu-Durga, Child Psychology, Kleptomania, Oral Pleasure.

মানুষের জীবনবিকাশের ধারাকে মনঃসমীক্ষক আর্নেস্ট জোন্‌স্‌ চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন— শৈশব (Infancy), বাল্য (Childhood), কৈশোর (Adolescence) ও প্রাপ্তবয়স (Adult Life) । শৈশব পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত, বাল্যকাল বারো বছর বয়স পর্যন্ত, কৈশোর আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত এবং প্রাপ্তবয়স আঠারো বছর বয়স থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।[১] সেই সূত্রে ‘শিশু’ শব্দটি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়। শৈশব, বাল্য, কৈশোর— মানবজীবনের এই তিন পর্যায়কেই তা আভাসিত করে। আপাতভাবে শিশুর আচরণ আমাদের কাছে অর্থহীন খামখেয়ালি বলে মনে হয়। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণে সেই আচরণই হয়ে ওঠে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের হাসি, কান্না, রাগ, বিদ্বেষ, খেলাধুলো, অভিমান, ভালোবাসা অঙ্গুলিনির্দেশ করে মনের এক-একটি বিশেষ দিকের প্রতি। আর সেই রহস্য উন্মোচনে আমাদের ডুব দিতে হয় মনস্তত্ত্বের গভীরে। বাংলাসাহিত্যে শিশুচরিত্র বললে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে যায় অপু-দুর্গার কথা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে দুটি সরল মুখ এবং তাদের বিচিত্র কর্মকাণ্ড, যার মধ্য দিয়ে পাঠক পৌঁছে যান তাদের মনোলোকের আনাচে-কানাচে। বর্তমান নিবন্ধে আমাদের অন্বিষ্ট বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’তে (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) শিশুমন ও তার স্বরূপ-সন্ধান।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শিশুচরিত্র অপু হলেও আমাদের সহানুভূতি অনেকটাই আদায় করে নেয় দুর্গা। দুর্গার শৈশবের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে পিসিমা ইন্দির ঠাকরুনের সাহচর্য। ইন্দির ঠাকরুনের সর্বক্ষণের সঙ্গী সে। পিসিমার কাছে গল্প ও ছড়া শোনা, পিসিমার সঙ্গে থেকে তার কাজে সাহায্য করা, জলখাবারের ভাগ পাওয়া পরিপুষ্ট করে দুর্গার শৈশব। পিসিকে সে যেমন ভালোবাসে, তেমনি পিসির কাছেই তার যাবতীয় মান-অভিমান-আবদার। তাই পিসি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে দুর্গা তার অভাব বোধ করে, রাতে বিছানায় শুয়ে পিসির জন্য কাঁদে, বাবা-মা পিসিকে অপছন্দ করলেও বার বার অনুরোধ করে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনে। ইন্দির ঠাকরুনের প্রতি দুর্গার ভালবাসা ঈর্ষান্বিত করে তার মা সর্বজয়াকে। লেখকের বর্ণনায়—

"ইন্দির ঠাক্‌রুন ফিরিয়া আসিয়াছে ছয় সাত মাস হইল, সর্বজয়া কিন্তু ইহার মধ্যে একদিনও বুড়ির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা কহে নাই। আজকাল তাহার আরও মনে হয় যে ঐ বুড়িডাইনি সাতকুলখাগীটাকে তাহার মেয়ে যেন তাহার চেয়েও ভালবাসে। হিংসা তো হয়ই , রাগও হয়। পেটের মেয়েকে পর করিয়া দিতেছে।"[২]

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, শিশু যাদের কাছে বেশি সময় থাকে, আদর-যত্ন লাভ করে, পূরণ হয় শিশুর ছোটোখাটো চাওয়া-পাওয়া, তাদের সাথেই শিশুর অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। সেই কারণেই পিসিমাকে দুর্গা এতো ভালোবাসে। পিসিমার মুখে শুনে শুনে সে রূপকথার গল্প ও ছড়া শেখে—

"ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া-কাঁথা-পাতা বিছানায় বসিয়া অনেক্ষণ পর্যন্ত একমনে পিসিমার মুখে রূপকথা শোনে। খানিকক্ষণ এ-গল্প ও-গল্প শুনিবার পর খুকি বলে,—পিতি, সেই ডাকাতের গল্পটা বল্ তো! গ্রামের একঘর গৃহস্থবাড়িতে পঞ্চাশ বছর আগে ডাকাতি হইয়াছিল, সেই গল্প। ইতিপূর্বে বহুবার বলা হইয়া গেলেও কয়েকদিনের ব্যবধানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, খুকি ছাড়ে না। তাহার পর সে পিসিমার মুখে ছড়া শোনে।"[৩]

শুধু দুর্গা নয়, আশপাশের শিশুদের প্রতি নজর দিলেও আমরা দেখবো তারা একই গল্প বারবার শুনতে চায়। আসলে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি তাদের আনন্দ দেয়, শিশুমন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডের মন্তব্যে আমরা এর সমর্থন পাই। 'Beyond The Pleasure Principle' গ্রন্থে ফ্রয়েড বলেছেন—

"And if a child has been told a nice story, he will insist on hearing it over and over again rather than a new one; and he will remorselessly stipulate that the repetition shall be an identical one and will correct any alterations of which the narrator may be guilty—though they may actually have been made in the hope of gaining fresh approval. None of this contradicts the pleasure principle, repetition, the re-experiencing of something identical, is clearly in itself a source of pleasure."[৪]

সেই গৃহস্থবাড়িতে ডাকাতির গল্প তাই দুর্গার কাছে পুরোনো হয় না। প্রতিবারই বিপুল আগ্রহ নিয়ে মনোযোগ সহকারে সে একই গল্প শোনে।

বালিকা দুর্গার বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশকে লেখক একটি ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ঘুমের মধ্যে সদ্যোজাত ভাইয়ের কান্না শুনে দুর্গা তাকে বিড়ালছানার ডাক বলে মনে করে। ভাঙা উনুনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা বিড়ালছানাগুলি হুলোবিড়ালের অতর্কিত আক্রমণে অমনভাবে চিৎকার করছে মনে করে ঘুমচোখেই তাদের দেখতে যায়। কিন্তু বিড়ালছানাগুলিকে নিরুপদ্রবে ঘুমোতে দেখে সে অবাক হয়। পরদিন সকালে আতুড়ঘরে ভাইকে দেখতে গিয়ে এবং তার কান্না শুনে দুর্গা পূর্বরাত্রির বিড়ালছানার ডাকের উৎস নির্ণয় করে। উপলব্ধি করে, সদ্যোজাত বিড়ালশিশু ও মানবশিশুর কান্নার সাদৃশ্যের কারণেই তার এই ভ্রান্তি। এইভাবে নানা ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার জগৎ ক্রমশ প্রসারিত হয় তার।

বাল্য-কৈশোরে কেবল খাওয়া-ঘুমোনো ছাড়া দুর্গার বাড়ির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। খেলার সরঞ্জাম ও ফলমূলের সন্ধানে সারাদিন একা একা সে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। মা তার এই স্বভাব পছন্দ না করায় ভয়ে মাকে সবসময় এড়িয়ে চলে। লক্ষণীয়, এই বয়সী ছেলেমেয়েরা সাধারণত সমবয়সী বন্ধুদের সাথে খেলাধুলোয় মত্ত থাকে। দুর্গা যেন সেখানে মূর্তিমান ব্যতিক্রম। তবে ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে তার আন্তরিক সম্পর্ক আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

ভাই অপুর সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করলেও তার প্রতি ছিল দুর্গার অপরিসীম স্নেহ, ভালোবাসা ও সহানুভূতি। সংগৃহীত ফলমূল কখনো অপুকে না দিয়ে সে খায় না। অপুর চুরি যাওয়া মাকাল ফল বহু কষ্টে বন-বাদাড় খুঁজে জোগাড় করে আনে। আম কুড়োতে গিয়ে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে পরম মমতায় ভাইকে আগলে রাখে। নিজে ভয় পেলেও অপুকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করে—

"তুই আমার কাছে আয়—দুর্গা তাহাকে কাছে আনিয়া আঁচল দিয়া ঢাকিয়া কহিল—এ বিষ্টি আর কতক্ষণ হবে—এই ধরে গেল বলে.....

শীতে অপুর ঠক্ ঠক্ করিয়া দাঁতে দাঁত লাগিতেছিল—দুর্গা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া শেষ আশ্রয়ের সাহসে বার বার দ্রুত আবৃত্তি করিতে লাগিল—নেবুর পাতায় করম্‌চা—হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা—হে বিষ্টি ধ'রে যা—নেবুর পাতায় করম্‌চা—...ভয়ে তাহার স্বর কাঁপিতেছিল।"[৫]

দুর্গার এই আচরণের পেছনে রয়েছে ভাইয়ের প্রতি তার অপরিসীম স্নেহ-মমতা এবং কর্তব্যবোধ। এতটুকু মেয়ের এই মমত্ববোধ আমাদের বিস্মিত করলেও তা অস্বাভাবিক নয়। এর পেছনে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। আমাদের সমাজে একটি ছেলে-শিশু ও একটি মেয়ে-শিশুর বেড়ে ওঠার পরিবেশ কিন্তু এক নয়। আচার-আচরণ, কথাবার্তায় মেয়েদের ধীর-স্থির-নম্র হতে হবে। স্নেহ-মমতা তাদের সহজাত গুণ। বিশেষ করে বড়ো সন্তানদের সবসময় ছোটোদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে। সমাজ-পরিবারে এই সমস্ত উপদেশের কথা মেয়েরা সবসময়ই শুনে চলেছে। ফলে এইরকম শাসন-উপদেশের বাতাবরণে লালিত মেয়ে-শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে ওঠে ছোটো ভাই-বোনদের প্রতি স্নেহশীল-দায়িত্বপরায়ণ। দুর্গার আচরণেও এই মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটেছে।

দুর্গা চরিত্রে চুরি করার বিশেষ প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনস্তত্ত্বে একে বলা হয় Kleptomania। Kleptomania হল এমন এক ধরনের মানসিক বিকৃতি, যেখানে একজন ব্যক্তি জিনিস চুরি করা থেকে কিছুতেই নিজেকে বিরত করতে পারে না। অথচ দেখা যায় চুরি করা জিনিসটিকে সে কাজেও লাগাতে পারবে না। জিনিসটিকে নিজের অধিকারে আনাই এই চুরির উদ্দেশ্য। সাধারণ চুরির সঙ্গে Kleptomania-র পার্থক্য রয়েছে। চুরি সাধারণত গভীর চিন্তা ও যথাযথ পরিকল্পনার দ্বারা সংঘটিত হয়। এর পেছনে বিশেষভাবে সক্রিয় থাকে লাভের চিন্তা। আর Kleptomania-র ক্ষেত্রে জিনিসটি প্রয়োজনীয় না হলেও ব্যক্তি এই কাজ করা থেকে নিজেকে আটকাতে পারে না।[৬] দুর্গা টুনুর খেলার বাক্স থেকে পুঁতির মালা এবং টুনির মায়ের সোনার সিঁদুর কৌটো চুরি করে আনে। পুঁতির মালাটি সে পুতুল খেলার বাক্সে আর সিঁদুর কৌটোটি তাকের ওপর লুকিয়ে রাখে। এগুলি ব্যবহার করতে পারবে না জেনেও সে চুরি না করে পারে না। ধরা পড়ে যাওয়ায় তাকে পাড়ার লোকের তিরস্কার-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। এমনকি মায়ের শাসন-প্রহারও তাকে চুরি থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। দুর্গার ডাকে ভুলো(কুকুর) হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলে আনন্দে দুর্গা আত্মহারা হয়ে পড়ে। খাওয়ার সময় নিজের ভাগ থেকে তার জন্য খাওয়ার সরিয়ে রাখে। কৈশোরে আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা প্রবল হয়। পোষ্যের আনুগত্যে দুর্গার সেই চাহিদাই অনেকাংশে পূরণ হয়। তাই ধুলো তার কথা শুনলে দুর্গা খুশি হয়ে ওঠে। অপুর মাস্টারমশাই নীরেনবাবুর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধে তার কিশোরী মনে লাগে আনন্দ-লজ্জা-কৌতূহলের দোলা। দুর্গার শিশুমনের অপূর্ণ স্বপ্ন রেলগাড়ি দেখা। মৃত্যুশয্যাতে শুয়ে সেই অপূর্ণ সাধ পূরণের ইচ্ছাই সে প্রকাশ করে—

"অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?"[৭]

কিশোরী দুর্গার সারল্য এই উক্তিতে স্পষ্ট।

উপন্যাসে অপুকে দেখি তার জন্মের সময় থেকে। মনস্তত্ত্বে শিশুর জন্মের পর থেকে মোটামুটি এক বছর পর্যন্ত বয়সকালকে বলা হয় Oral phase। এই পর্বে মায়ের দুধ খাওয়া বা কোনোকিছু চোষার মধ্য দিয়ে শিশু মুখের সুখ (Oral pleasure) লাভ করে।[৮] অর্থাৎ শৈশবের একেবারে প্রথম পর্যায়ে শিশুর যৌনচেতনা কেন্দ্রীভূত থাকে মুখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফ্রয়েড 'যৌনতা'(Sexuality) শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। 'An Autobiographical Study' গ্রন্থে ফ্রয়েড বলেছেন—

“In the first place sexuality is divorced from its too close connection with the genitals and is regarded as a more comprehensive bodily function, having pleasure as its goal and only secondarily coming to serve the ends of reproduction.”[৯]

অর্থাৎ যৌনসুখ বলতে তিনি কেবল যৌন-অঙ্গ নয়, যে কোনো শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা আনন্দলাভকে বুঝিয়েছেন। দশ মাস বয়সে অপুর নিচের মাড়িতে দুটি দাঁত ওঠে। এই সময় সে মাটির ঢেলা, কাঠের টুকরো, মায়ের আঁচল, দুধ খাওয়ার কাঁসার ঝিনুক, বাবার চটিজুতো ইত্যাদি যাকিছু নাগালের মধ্যে পায়, তাই মুখে দেয়, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। চরিতার্থ হয় শিশু অপুর মুখের সুখ। ছয় বছর বয়সে অপু প্রথম বাবার সাথে বাড়ি থেকে দূরে যায়। ‘বর্ণপরিচয়’-এ পড়া ‘খ’-এ খরগোশকে জীবন্ত লাফানো অবস্থায় দেখে তার আনন্দ-বিস্ময়ের সীমা থাকে না। অত্যন্ত কাছ থেকে নীলকুঠি ও কুঠির মাঠ দেখে অভিভূত হয়। অবাক হয় ছোটো ছোটো গাছে পাকা কুল ধরে থাকতে দেখে। চুলকানি সৃষ্টিকারী আল্‌কুশির উজ্জ্বল রঙের ফলের থোলো হাতে ছিঁড়তে গিয়ে বাবার বকা খায়। বাড়ির বাইরে পা রেখে অপুর বাস্তব অভিজ্ঞতার জগৎ ধীরে ধীরে বিকশিত হতে শুরু করে।

ছোটোবেলা থেকে মায়ের মুখে পুরাণ-রূপকথার গল্প ও ছড়া শুনে বড়ো হওয়া অপু অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ। দুপুরবেলা হাতের লেখা লিখতে লিখতে মায়ের মুখে সুর করে কাশীদাসি মহাভারত শুনতে অপু ভালোবাসে। ‘চিরদিনের কৃপার পাত্র কর্ণ’[১০]-র দুঃখে তার চোখে আসে জল। সাথে সাথে মানুষের দুঃখে দুঃখিত হওয়ার অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে ওঠে তার শিশুমন। অপু গাছের কোনো হালকা বাঁকা ডালকে হাতে নিয়ে সকালে-বিকালে নির্জন নদীর ধারে, বাঁশবনের পথে, বাড়ির পেছনে তেঁতুলতলায় আপনমনে ঘুরে বেড়ায়। নিজেকে কল্পনা করে ‘কখনো রাজপুত্র, কখনো তামাকের দোকানী, কখনো ভ্রমণকারী, কখনো বা সেনাপতি, কখনো মহাভারতের অর্জুন’[১১]। আর ওই অবস্থায় যেসব ঘটনা জীবনে ঘটলে তার আনন্দ হবে, আপনমনে সেইসব ঘটনাই বিড়বিড় করে বলে চলে। বিশেষত, মহাভারতের যুদ্ধের বর্ণনা শুনে তার মন ভরে না। তাই পূর্বোক্ত ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে মনের মতো করে যুদ্ধের বর্ণনা করে চলে—

“দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন করলেন কি, একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে! তারপর—ওঃ—সে কি যুদ্ধ! কি যুদ্ধ! বাণের চোটে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল!”[১২]

এই অবস্থায় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারে মনের আনন্দে। তবে কেউ দেখে ফেললে স্বভাবলাজুক অপু হাত থেকে লাঠি ফেলে দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় গল্প করতে আসা ব্যক্তিদের, বিশেষত সান্যাল মশাইয়ের দেশভ্রমণের গল্প অপু যেন হাঁ-করে গেলে। এই গল্পগুলি তাকে দেয় মানসভ্রমণের আস্বাদ। বড়োদের মুখে শোনা গল্পের ঘটনা-চরিত্র-পটভূমিকে সে বাস্তবের সাথে মেলানোর চেষ্টা করে নিজ কল্পনার দ্বারা। শোনা গল্পের চরিত্রগুলির সমব্যথী অপু নিজেও হয়ে ওঠে গল্পেরই চরিত্র। এই কল্পনার আবেশ তার মনে জাগায় এক অব্যক্ত আনন্দের অনুভূতি। দূরের অশ্বত্থ গাছের মাথা, নীল রং-এর আকাশ, ঘুড়ি, নীলকুঠির মাঠ, দূর-আকাশে উড়ে যাওয়া চিল তার কল্পনাপ্রবণ বালকমনকে নিয়ে যায় দূর রূপকথার দেশে। কিন্তু সেই দূরের দেশে মা নেই। তাই মায়ের কথা মনে পড়তেই সেই অসম্ভবের, অজানার রাজ্য থেকে এক ছুটে সে মায়ের কাছে চলে আসে। আশ্বস্ত হয় মাকে জড়িয়ে ধরে। গ্রামের বারোয়ারিতলায় যাত্রা উপলক্ষ্যে অপুর আনন্দ-উচ্ছ্বাস-বিস্ময়-কৌতূহল আর বাঁধ মানে না। তার কল্পনায় নাটকের ঘটনা-চরিত্র যেন বাস্তবের সাথে একীভূত হয়ে যায়—

“ঘাটের পথে যাইতে পাড়ার মেয়েরা কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে, অপুর মনে হইল কেহ ধীরাবতী, কেহ কলিঙ্গদেশের মহারানী, কেহ রাজপুত্র অজয়ের মা বসুমতী। দিদির প্রতি কথায়, হাত পা নাড়ার ভঙ্গিতে, রাজকন্যা ইন্দুলেখা যেন মাখানো!”[১৩]

যাত্রার কয়দিন আনন্দে-উৎসাহে অপু খাওয়া, ঘুম সব ভুলে যায়। জীবনের চরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় যাত্রার দলে যোগ দেওয়া—

“জড়ির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড় হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, উহাই তাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য।”[১৪]

যাত্রার লোকেদের সামনে গান গেয়ে প্রশংসা কুড়িয়ে আনন্দে-গর্বে আত্মহারা হয়ে পড়ে সে। কেবল গান গাওয়া নয়, গল্প-নাটক লিখেও সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। নিজ গুণাবলীর দ্বারা সকলের সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে পেরে খুশি হয়ে ওঠে অপুর বালকমন।

বাবার কাছ থেকে ছুটি পেলে বইপত্র কোনোরকমে রেখে অপু এসে দাঁড়ায় উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে। গাছপালা, তার নিবিড় ছায়া, পড়ন্ত রোদের খেলা, ‘তাজা মাটির গন্ধ’[১৫], উজ্জ্বল রঙিন ডানাওয়ালা পাখির উড়ে যাওয়া— সবমিলিয়ে এক অনির্বচনীয় মুক্তির আনন্দে তার মন ভরে ওঠে। একই আনন্দ সে লাভ করে গ্রামের বৃদ্ধ নরোত্তম দাস বাবাজীর সান্নিধ্যে। বাবা বাড়িতে না থাকলে শাসন-বন্ধনমুক্ত অপু সারাদিন বাড়ির বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, পড়াশোনার কোনো বালাই নেই। অথচ পড়ায় যে তার একেবারে মন নেই, তা নয়। ঠাকুরদা রামচাঁদ তর্কালঙ্কারের তালপাতার পুথি ও খাতাপত্র নেড়েচেড়ে দেখতে তার শিশুমন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। সে চায় ঈশ্বরচন্দ্রের ‘চরিতমালা’র কৃষকপুত্র রস্কোর মতো প্রকৃতির সান্নিধ্যে জ্ঞানার্জন করতে, বাড়িতে আবদ্ধ অবস্থায় নয়। বাড়ির সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে তার মুক্তিপাগল মন কেবল হাঁপিয়ে ওঠে। বই তার কাছে অজানা জগতের প্রবেশদ্বার। বই পড়ার প্রবল আগ্রহে বইয়ের বিনিময়ে দুপুরবেলা সতুদের পুকুরের মাছ পাহারা দেওয়ার শর্তেও রাজি হয়ে যায়। বাবা ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকা নেওয়া শুরু করলে অপু আনন্দে উদ্‌বেল হয়ে ওঠে। সুরেশের কাছ থেকে নেওয়া বইটিতে বিভিন্ন দেশের নাবিকদের কথা পড়ে অপুর কেবল নানা নদী-সমুদ্রে বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে। কেননা ‘দূর দেশের কথা ও সকল রকম মহত্ত্বের কাহিনী ছেলেবেলা হইতেই তাহার মনকে বড় দোলা দেয়’[১৬]। পটুর সঙ্গে ডিঙায় চেপে ঘুরতে বেরিয়ে কল্পনায় অপু যেন সমুদ্রযাত্রার স্বাদ পায়। নিজেকে মনে করে ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকায় উল্লিখিত ‘বিলাত-যাত্রী’[১৭]। অপু সর্বপ্রথম একা একা দূরে যাওয়ার আনন্দ পায় গঙ্গানন্দপুরে সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরবাড়িতে মায়ের মানতের পুজো দিতে যাওয়ার সময়। দীর্ঘপথের দু’ধারের গাছপালা, ফুল, পাখি, মাঠ, মাটির গন্ধ তার মনকে ভরিয়ে তোলে। পথচলার আনন্দে এগিয়ে চলে সে। ভিন্ন গ্রামের অচেনা অনুভূতি মনে আনে নতুন দেশ আবিষ্কারের আনন্দ। নিশ্চিন্দিপুর, বিশেষত সেখানকার উন্মুক্ত প্রকৃতির উদার সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে অপুর মন কেমন করলেও ট্রেনে চেপে কাশী যাওয়ার সময় তার উপলব্ধি—

> “অবাধ মুক্ত জীবনের আনন্দ সে পাইল এই প্রথম, তার চিরকালের বাঁশবনের বেড়া ঘেরা ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ পল্লীজীবনে এরকম সচল দৃশ্যরাজি, এরকম অভিনব গতির বেগ, এত অনিশ্চয়ের পুলকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখনও হয় নাই—যে জীবন চারিধারে পাঁচিল দেওয়াল তুলিয়া আপনাকে আপনি ছোট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আজ চলিয়াছে, চলিয়াছে, সম্মুখে চলিয়াছে—ওই পশ্চিম আকাশের অস্তমান সূর্যকে লক্ষ করিয়া—নদ-নদী, দেশবিদেশ—ডিঙাইয়া ছুটিয়াছে—এই চলিয়া চলার বাস্তবতাকে সে প্রতি হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেছিল আজ!”[১৮]

একদিকে অজানা ও দূরের প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে চিরপরিচিতের প্রতি আসক্তি ছোটোবেলা থেকেই অপুর মনে সৃষ্টি করে প্রবল দ্বন্দ্ব। কল্পনায় দূর দেশে ভেসে যাওয়া, আবার ছুটে মায়ের কাছে আসা; একদিকে নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগে নাড়ী-ছেঁড়ার যন্ত্রণা, অন্যদিকে গ্রাম থেকে বেরিয়ে মুক্তির আনন্দ, গতির আবেশ— এই দুই বিপরীতমুখী আবেগে বারবার দোলায়িত হয় তার শিশুমন। শৈশবের এই মানোভাব তার পরিণত জীবনকেও প্রভাবিত করে। সংসারে জড়িয়ে থাকলেও অপুর মন তাই বরাবরই বহির্মুখী। সুযোগ পেলেই সংসারের মায়া কাটিয়ে সে পা বাড়ায় অজানা-অচেনা জগতে।

মা-দিদির মুখে রাক্ষস-ডাইনির গল্প শুনে অপু বড়ো হয়। এই গল্পগুলি তার চেতনায় এক ভয়-ভীতির জগৎ গড়ে তোলে। ভূত-প্রেত-ডাইনির অস্তিত্বে তার বিশ্বাস জন্মায়। ফলে রাতের অন্ধকারে অপু ভয় পায়। একই কারণে দুর্গাও রাত্রিতে একা একা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে পারে না। নীলুদার সঙ্গে দক্ষিণ মাঠে পাখির ছানা দেখতে গিয়ে পথ হারিয়ে সে আতুরী বুড়ির বাড়ির উঠোনে এসে পড়ে। আতুরী বুড়িকে দেখে ডাইনি ভেবে আতঙ্কিত হয়। মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, মায়ের কথা অমান্য করার জন্যই তার এই বিপদ। শোনা গল্পের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আর বেঁচে ফেরার আশা না থাকলেও ছাড়া পেতে সে ডাইনির কাছে কাকুতিমিনতি করতে থাকে। আর সুযোগ পেয়েই সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

অপুর তীব্র ঘ্রাণশক্তির পরিচয় উপন্যাসে নানাপ্রসঙ্গে উঠে এসেছে। তাজা মাটির গন্ধ যেমন তার মনকে বিভোর করে, তেমনি ঘরের আসবাবপত্রের পুরোনো পুরোনো গন্ধ তাকে মগ্ন করে অতীত কল্পনায়। বইয়ের পুরোনো গন্ধে তার বাবাকে মনে পড়ে। অপুর কৌতূহলী বালকমনের পরিচয়ও আমরা উপন্যাসে পাই। ‘সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ’ গ্রন্থে শকুনের

ডিমের ভিতর পারদ পুরে কয়েকদিন রৌদ্রে রেখে সেই ডিম মুখে ঢুকিয়ে মানুষের আকাশে ওড়ার যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য অপু অনেক চেষ্টায় শকুনের ডিমও জোগাড় করে ফেলে। বন্ধ বাক্স-প্যাঁটরার ভিতরের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তার কৌতূহলের সীমা থাকে না। গ্রাম ছেড়ে কাশী যাওয়ার সময় রেলগাড়ি, মাঝেরপাড়া স্টেশন, টেলিগ্রাফের কল দেখে তার কৌতূহলী মন বিস্মিত হয়।

কাশীর বন্ধুদের কাছে কিশোর অপু বাবার পরিচয় লুকোয়। এই বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশের চাহিদা হয় প্রবল। তাই কাশীর ঘাটের সামান্য কথকঠাকুরকে বাবা বলে পরিচয় দিতে সে লজ্জা পায়। নিজেকে জাহির করার তাগিদ থেকে বন্ধুদের কাছে বানিয়ে বলে যে তার বাবা কন্ট্রাক্টর। দেশে তাদের জমিদারি ও বড়ো বাড়ি আছে। কাশীর বাড়িতে তারা এসেছে হাওয়া বদলাতে। সর্বোপরি লুকিয়ে চুরুট খাওয়ার নিষিদ্ধ উত্তেজনায়, লীলার প্রতি মুগ্ধতা-ভালোবাসার রোম্যান্টিক অনুভূতিতে অপুর কিশোরমন অপরূপ শিল্পসার্থকতা লাভ করে।

উপন্যাসে দুই ভাই-বোনের (অপু-দুর্গা) মধ্যে গভীর স্নেহ-ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু দুর্গা নয়, অপুও দিদিকে ভীষণ ভালোবাসে। মা দিদিকে বকলে বা মারলে দিদির প্রতি করুণায় অপুর চোখে জল আসে। আবার নিজে মায়ের বকা খেলে তার অভিমান হয়, রাগ হয়, হিংসে হয় দিদির প্রতি। মনস্তত্ত্বে ভাই-বোনের এই পারস্পরিক ঈর্ষার মনোভাবকে বলা হয় Sibling Rivalry । এটি শৈশব-কৈশোরের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। সাধারণত বাবা-মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা-মনোযোগ হারানোর সম্ভাবনায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং সহোদরের প্রতি ঈর্ষা বোধ করে।[১৯] পরস্পর ঝগড়া-মারামারি করলেও দু’জন যেন দু’জনকে চোখে হারায়। দিদি ওড়্‌কলমি ফুলের নোলক পরিয়ে দিলে অপছন্দ সত্ত্বেও অপু নিষেধ করতে পারে না নানা নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্যের প্রলোভনে। দুর্গার কুড়িয়ে আনা কাঁচা আম, আশ-শ্যাওড়ার ফল দু’জনে ভাগ করে খায় পরম তৃপ্তিতে। চিনিবাস ময়রা তার লোভনীয় খাদ্যসামগ্রী বেচতে এলে অপু-দুর্গা তার পেছন পেছন বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। উক্ত দৃশ্যগুলিতে দুটি দরিদ্র শিশুর খাদ্যলোলুপ সরল মন অসাধারণ দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন লেখক। এপ্রসঙ্গে বলতে হয়, অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের সন্তান হওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের মধ্যে অপু-দুর্গা বড়ো হয়নি। ভালো জিনিস খাওয়ার সৌভাগ্যও তাদের হয়নি। ফলস্বরূপ অপরিতৃপ্তই থেকে যায় তাদের ভালোমন্দ খাওয়ার চাহিদা। আর সেই কারণেই তারা বনবাদাড় খুঁজে ফলমূল জোগাড় করে আনে বা চিনিবাস ময়রার পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়। দিদির সাথে অপু ঝড়ে আম কুড়োতে যায়, চড়ুইভাতি করে, চড়কের মেলায় যায়। তারা পরস্পরের খেলারও সঙ্গী। দু’জনের আলাদা আলাদা খেলার বাক্স আছে। সেগুলি রং-চটা কাঠের ঘোড়া, টিনের ভেঁপু-বাঁশি, কড়ি, দু’পয়সা দামের পিস্তল, শুকনো নাটা ফল, খাপরার কুচি, আমের গুটি, পুতুল, রাংতা, ছোপানো কাপড়, আলতা, টিনমোড়া আরশি, পাখির বাসা ইত্যাদি শিশুর মহামূল্যবান সম্পদে পূর্ণ। দুর্গা সারাদিনে বহুবার তার পুতুলের বাক্স গোছায়। দু’জনে দোকানঘর তৈরি করে কেনাবেচা খেলে। বড়ো ছেলেদের খেলার দলে জায়গা পেতে অপুর বালকমন অস্থির হয়ে ওঠে। শিশুর খেলার মধ্য দিয়ে তাদের বিশেষ মানসিকতার পরিচয় মেলে। ‘Beyond The Pleasure Principle’ গ্রন্থে ফ্রয়েড বলেছেন—

“It is clear that in their play children repeat everything that has made a great impression on them in real life, and that in doing so they abreact the strength of the impression and, as one might put it, make themselves master of that situation. But on the other hand it is obvious that all their play is influenced by a wish that dominates them the whole time—the wish to be grown-up and to be able to do what grown-up people do.”[২০]

বাস্তবিকই বাস্তবজীবনে যে বিষয়গুলি শিশুদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে, নিজেদের খেলায় তারা সেই বিষয়গুলিরই পুনরাবৃত্তি ঘটায়। বড়ো হয়ে ওঠার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তাদের খেলায় বড়োদের কাজ ও আচরণের অনুকরণ দেখা যায়। অপু-দুর্গার খেলার মধ্যেও উক্ত মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটে। দুর্গার মৃত্যুর পরও তার অস্তিত্ব অপুর চেতনায় সজীব। চড়কের মেলা, লাল রং-এর রাংচিতা ফুল, ওড়কল্‌মি ফুল অপুর মনে মৃত দিদির স্মৃতি বয়ে আনে। কেননা এগুলির সঙ্গে তার দিদির অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খেলা করার পথেঘাটে, আমতলায়, বাঁশবনে, ভাঙা কোঠাবাড়ির প্রতি গৃহকোণে অপু দিদিকে কাছে পায়। গ্রামত্যাগের সময় দিদিকে ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা তার মনকে ব্যথাতুর করে তোলে।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে, বিভূতিভূষণের লেখনীর স্পর্শে ‘পথের পাঁচালী’তে অপু-দুর্গা যেন রক্ত-মাংসের জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। ইন্দির ঠাকরুনের প্রতি দুর্গার ভালোবাসা, ভাইয়ের প্রতি মমত্ববোধ, চুরি করার প্রবণতা, অজানা ও দূরের প্রতি অপুর আকর্ষণ, কল্পনাপ্রবণতা, লজ্জা, ভয়, কৌতূহল, অপু-দুর্গার খেলাধুলো, পারস্পরিক স্নেহ-ভালোবাসা-ঈর্ষা তাদের মনোজগতেরই উন্মোচন ঘটায়। পাঠক লাভ করেন শিশুমনের অন্তরলোকে বিচরণের এক অতুলনীয় আস্বাদ।

তথ্যসূত্র :

১। Jones, E. , ‘Some Problems Of Adolescence’, British Journal of Psychology, Vol. 13, Issue 1, July 1922, P.34.

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, এস.এন.রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, পৃ: ১৭ ।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, এস.এন.রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৬ ।

৪। Freud, S. , ‘Beyond The Pleasure Principle’, Translated and edited by J. Strachey,1961, W.W Norton And Company, New York, London, P. 29-30.

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, এস.এন.রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৫২-৫৩ ।

৬। Kleptomania, Retrieved from: https://en.m.wikipedia.org>wiki>Klept…., Accessed on : 07.01.2018, Time: 7.00 PM.

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, এস.এন.রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, পৃ: ১৬৬ ।

৮। Freud, S. , ‘An Autobiographical Study’, Translated by J. Strachey, Fifth Impression 1950, The Hogarth Press, London, P. 62-63.

৯। Freud, S. , ‘An Autobiographical Study’, Translated by J. Strachey, Fifth Impression 1950, The Hogarth Press, London, P.67-68.

১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, এস.এন.রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৩৩ ।

১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, এস.এন.রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৯৪ ।

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, এস.এন.রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৩৪ ।

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, এস.এন.রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, পৃ: ১২১ ।

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, এস.এন.রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, পৃ: ১২৩ ।

১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, এস.এন.রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৮৪ ।

১৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, এস.এন.রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, পৃ:১৪৯ ।

১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, এস.এন.রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, পৃ:১৫২ ।

১৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, ‘পথের পাঁচালী’, প্রথম প্রকাশ, ত্রয়োবিংশ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, এস.এন.রায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩, পৃ:১৬৭-১৬৮ ।

১৯। Freud, S. , ‘On The Sexual Theories Of Children’, Freud-Complete Works, Edited by Ivan Smith, 2010, Retrieved from: https://valas.fr>IMG>pdf>Freud..., Accessed on: 20.06.2017, Time: 8.00 PM., P. 1968.

২০। Freud, S. , ‘Beyond The Pleasure Principle’, Translated and edited by J. Strachey,1961, W.W Norton And Company, New York, London, P.10-11.